একটি নিয়ম-নির্ভর বিন্যাসের জন্য ভারতের নীতিঃ অসঙ্গতি ও অসম্বদ্ধতা

অতুল মিশ্র

১৯ আগস্ট, ২০২৪

বিশ্বের মুখ্য শক্তি, যেগুলি নিজেদের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক নীতির বৃহৎ কাঠামোটির রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে, সেগুলির পররাষ্ট্র নীতি বোঝার জন্য "আন্তর্জাতিক বিন্যাস" একটি অতিপ্রয়োজনীয় ধারণা। সাম্প্রতিক কালে, নতুন দিল্লি তার নিজের পছন্দের আন্তর্জাতিক বিন্যাসকে বর্ণনা করার জন্য "নিয়ম-নির্ভর আন্তর্জাতিক বিন্যাস" বা "রুল-বেসড ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার" (আরআইও) ব্যবহার করছে। ২০১৮ সালে, সিঙ্গাপুরের সাংগ্রি-লা ডায়ালগে, তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরআইও-র প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করেন। তার পর থেকেই, ভারতের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে মার্কিন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন, অনেক সময়ই এই শব্দটি ব্যবহার করছেন। এই পরিভাষাটি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন দিল্লি ঠিক কি বোঝাতে চায়? আর আরআইও-কে গড়ে তোলার জন্য সে ঠিক কি করছে?

যে পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা জুড়ে আছে "বিশ্বগুরু" (পৃথিবীর শিক্ষক), "বিশ্ববন্ধু" (পৃথিবীর সঙ্গী), এবং "বসুধৈব কুটুম্বকম" (সমস্ত পৃথিবী একটিই পরিবার) জাতীয় অতি মহিমান্বিত ও অনির্দিষ্ট কিছু ধারণা, তার তুলনায় আরআইও শুনতে আরামদায়কভাবে উত্তেজনাহীন এবং তা স্পষ্টতা ও বাহুল্যহীনতার অঙ্গীকার দেয়।

নতুন দিল্লি দুটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই ধারণাটিকে ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে একটি হল সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতে। এই দিক থেকে দেখলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে আন্তর্জাতিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সঙ্গে আরআইও-র মিল আছে বলে মনে হয়। তাঁর সাংগ্রি-লা বক্তৃতাটিতে মোদী বলেছেন যে, নতুন দিল্লি বিশ্বাস করে যে সার্বভৌমত্ব, প্রাদেশিক অখণ্ডতা, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে সাম্যভাবের উপর রাষ্ট্রের বিশ্বাস

আরআইও-কে মূর্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, আরআইও-কে এমন সমস্ত নিয়ম ও রীতিকে তুলে ধরতে হবে, যা "হাতে গোনা কয়েকটি ক্ষমতার অনুমোদনে নয়, বরং সকলের সম্মতিক্রমে নির্মিত।" তিনি তার সঙ্গে যোগ করেন যে, আরআইও-কে "শক্তি নয়, আলোচনার উপর বিশ্বাস" রাখতে হবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছে, সেগুলিকে সম্মান করতে হবে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের লেখা *দ্য ইন্ডিয়া ওয়ে* নামের বইটি আরআইও-র এই উপাদানগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুপাক্ষিকতা, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং টেঁকসই পরিবর্তনের জন্য ভারতের নেতৃত্বে সারা বিশ্বের প্রয়াসের মত নানা নীতির অধীনে নতুন দিল্লি এই বিশ্ব-বিন্যাসে সংস্কার আনতে চাইছে।

শুধু যে ১৯৪৫ সালের বিন্যাস ও ভারতের আরআইও-র বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে, তাই-ই নয়, দ্বিতীয়টি নেহরুর সময়ের চিন্তা ও কূটনীতির ধারাবাহিকতাকেও বহন করে এবং ১৯৫৪ সালে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সময় আন্তঃরাষ্ট্র আচরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত পঞ্চশীল নীতির উপাদানকেও আত্মস্থ করে। সম্প্রতি, সম্ভবত আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে পশ্চিমের নেওয়া পন্থার বিপরীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, চিন পঞ্চশীলকে আবার সমর্থন জানাতে শুরু করেছে, কারণ চিনের মতে পাশ্চাত্যের পন্থা আগ্রাসী ও অনধিকার হস্তক্ষেপে অতি উৎসুক। কৌতুকজনকভাবে, ভারতের সীমান্তে চিনের যা কার্যকলাপ, তা, সার্বভৌমত্বের জন্য পরস্পরকে মর্যাদাদান, প্রাদেশিক অখণ্ডতা সহ পারস্পরিক অনাক্রমণাত্মক আচরণের মত ওই নীতিগুলিকেই লঙ্ঘন করেছে।

এর পাশাপাশি, একটি আঞ্চলিক প্রেক্ষিতও আছে, যা ভারতের চিন্তায় তুলনামূলকভাবে নতুন একটি সংযোজনকেও তুলে ধরে। এই নতুন যোগটি হল ইন্দো-প্যাসিফিক। গ্লোবাল কমন্স, স্থায়িত্ব, ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্বের কারণে, ইন্দো-প্যাসিফিক বিশ্বের কৌশলগত ভূগোলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিন্তু এই অঞ্চলকে পরিচালনার কাঠামোটি এখনও প্রারম্ভিক স্তরেই আছে। ভারত বুঝেছে যে এখানে একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং নিজের হাতে দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। সাংগ্রি-লা বক্তৃতায় মোদী মুক্ত সমুদ্র, উপদ্রবহীন সাগরাঞ্চল, যোগাযোগ, আইনের নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে

নির্মিত একটি ইন্দো-প্যাসিফিক বিন্যাসের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ইন্দো-প্যাসিফিকে নিয়মভিত্তিক একটি বিন্যাস নির্মাণের জন্য নতুন দিল্লি সমমনস্ক রাষ্টগুলির সহযোগিতা চাইছে।

এইভাবে, নতুন দিল্লিকে একটি প্রধান ক্ষমতা হয়ে উঠতে গেলে বিশ্ব-বিন্যাসের *সংস্কার* এবং আঞ্চলিক বিন্যাসের *সহ-নির্মাণ* – এই দুই কাজই করতে হবে। একটি গবেষণাপত্রে সাম্প্রতিক দশকের আন্তর্জাতিক বিন্যাসের বিশ্লেষণ করার সময় আমি আবিষ্কার করি যে, মোদীর বক্তৃতার পর থেকে, এই বিষয় নিয়ে নতুন দিল্লির চিন্তাভাবনা একেবারেই বদলায় নি। যে বছর ভারত জি২০ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করে, সে বছর আরআইও নিয়ে অনেকটাই কম আলোচনা হয় এবং আলোচনার বিষয় হিসেবে আধিপত্য করে "গ্লোবাল সাউথ।" কিন্তু আরআইও-র গুরুত্ব আবার ফিরে আসছে।

ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে সংযোগ আরআইও

ভারত যে এই শব্দটিকে তার পশ্চিমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের সময় ব্যবহার করে, তা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। বিন্যাস নিয়ে ভারত ও পশ্চিমের দেশগুলির চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। ২০২২ সালে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে মার্কিন দেশের রাষ্ট্র সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের বক্তৃতাটি যেমন দেখায়, পশ্চিমেরও এই মত যে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিন্যাসটি আইন-নির্ভর এবং এর উৎপত্তি ১৯৪৫ সালে। পশ্চিমের দেশগুলি অ-পশ্চিমী শক্তিগুলির, বিশেষ করে রাশিয়া ও চিনের, ভূ-রাজনৈতিক সংস্কারবাদকে ১৯৪৫-এর বিন্যাসের ভিত্তিগত আদর্শ, অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রাদেশিক অখণ্ডতার জন্য মূল বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর উদাহরণ হিসেবে পশ্চিমের দেশগুলি উল্লেখ করে নির্বাচনে তথাকথিত হস্তক্ষেপ, গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা ও সেই কাজে সাফল্য, ইউক্রেনের উপর আক্রমণ, তাইওয়ান সহ এশিয়ার অন্যান্য পশ্চিমের মিত্র দেশগুলির উপর জুলুম যা এই আদর্শকে, এবং ফলত আরআইও-কেও, গভীর বিপদে ফেলছে।

নীতির ধাঁধা

চিন্তার এই মিল থেকে বোঝা যায় যে, আরআইও-কে নিরাপদ করতে ও তার নির্মাণের জন্য পশ্চিমই ভারতের প্রকৃত সঙ্গী। এবং বাস্তবিকই, বিশ্ব ও গ্লোবাল সাউথকে ঘিরে গড়ে ওঠা উচ্চাকাঙ্ক্ষার পূরণের জন্য পশ্চিমের

অনেক দেশই ভারতের কৌশলগত সঙ্গী। তবে, এই বিন্যাসকে নির্মাণের জন্য নতুন দিল্লির পন্থা ও কাজকর্ম বিভ্রান্তিজনক এবং সেগুলি তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা তৈরি করে। তিনটি উদাহরণ বিবেচনা করলে এই বিষয়টি বোঝা যাবে।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক বিন্যাসকে রূপদানের জন্য ভারতের প্রচেষ্টার পথে চিন একটি সুবিশাল বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের স্তরে, অন্যান্য প্রতিবন্ধকের সমাধান হয়ে গেলেও, সিকিওরিটি কাউন্সিলে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে ভারতের আবেদন চিনের প্রত্যাখানের কারণে ব্যাহত হবে। চিনের দিক থেকে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার গ্রুপের সদস্যপদের জন্য ভারতের আবেদনের বিরোধিতা, বিআরআইসিএস যৌথে ভারতের প্রভাব কমানো এবং সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী পদক্ষেপ দুর্বল করার প্রচেষ্টা – এই উদাহরণগুলি থেকেই চিনের মানসিকতার অভিমুখ বোঝা যায়। এছাড়াও, বিস্তৃত প্রতিবেশী অঞ্চলে যুদ্ধ-পরবর্তী বিন্যাসকে বাড়াতে, চিন এমনকি সামরিক সংঘর্ষেও লিপ্ত হতে পারে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক নির্মাণকে নিয়ে চিন অখুশি। এই নির্মাণকে চিন তার প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করার কৌশল হিসেবে দেখে এবং, এই কারণে এই অঞ্চলে বিন্যাস-নির্মাণে চিনের বিরোধিতার কারণে, এই অঞ্চলকে ঘিরে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমিত হয়ে পড়ে।

চিন যে শুধু ভারতের বিশ্ব-কেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথেই বাধা তৈরি করে তা নয়, দ্বিপাক্ষিক, নিয়ম-নির্ভর ব্যবস্থাকেও সে তুচ্ছ করে। গত দশক ধরে বেইজিং-এর প্রায় সমস্ত কার্যকলাপ, ১৯৮০-র দশকের শেষে উভয়পক্ষের সম্মতিতে নির্মিত বিবাদমান সীমান্তঅঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো, বা "নিয়ম"-এর ক্ষতি করেছে। ভারত তুমুল ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও, তার এই দিকটিকে ভারত ও চিনের মধ্যে তুলনা করার সময় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। চিন ও ভারতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যে আপেক্ষিক তফাৎ দেখা যায়, চিনের সংস্কারবাদের গতিরোধ করার সময় তা নিজের দায়িত্বে কাটিয়ে ওঠা নতুন দিল্লির জন্য দুরূহ হয়ে ওঠে। গালওয়ানের খণ্ডযুদ্ধ চলাকালীন চার বছরব্যাপী কূটনৈতিক কার্যকলাপের সময়ই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

দুই দেশের ক্ষমতার মধ্যে এই পার্থক্যের কারণে, চিনের শক্তির বিরুদ্ধে ভারসাম্য তৈরি করা ভারতের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যার ফলশ্রুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত মৈত্রই সম্পর্কের বৃদ্ধি ও

কোয়াডে নতুন দিল্লির প্রচেষ্টা। এবং খানিকটা ভারসাম্য তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, পশ্চিমের সঙ্গে আরও বেশি সামরিক কৌশলগত সমন্বয় করতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, নতুন দিল্লি অতিসতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছে।

ভারত যে কোনও রকম বিপদ-সঙ্কুল পদক্ষেপ নিতে চায় না, তার একটি বাহ্যিক কারণ হল, এই দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক, যেখানে তাইওয়ান ও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিয়ে বড় বড় ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই অঞ্চল জুড়ে চিন-আমেরিকার ক্ষমতা প্রদর্শনের যে সুবৃহৎ খেলাটি চলে, তাতে জড়িয়ে পড়তে ভারত অনিচ্ছুক। ভারসাম্য তৈরির এই খেলা আরও প্রখরভাবে খেলতে ভারতের অনিচ্ছার পিছনে হয়ত দেশের আভ্যন্তরীণ কারণ আছেঃ নেতাদের যৌথ মূল্যায়ণ হল এই যে, সুবিশাল যুদ্ধ ও ব্যাপকতর জমি হারান ঠেকানর জন্য, ছোটখাট বিবাদ এবং জমির ক্ষুদ্রতম অংশ হারান মেনে নেওয়া যায়।

কোয়াডের অন্য দুই সদস্য রাষ্ট্র জাপান ও অস্ট্রেলিয়াও চিনের বিষয়ে একই রকম সতর্ক। এই দুই দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি আরও খানিকটা স্পষ্ট হয়। জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি উপভোগ করে এবং অস্ট্রেলিয়ার হাতে আছে এএনজেডইউএস ও এইউকেইউএস-র মাধ্যমে বন্টিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং এর পাশাপাশি, এনএটিও-র সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে। এই উল্লিখিত সংগঠনগুলির সব কটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত। নিরাপত্তা বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং ভূ-রাজনীতির তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার কারণে জাপান তার নিরাপত্তা বিষয়ক অবস্থানের পুনর্বিবেচনা করছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য জাপানের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার আচ্ছাদন আছে। ভারত চিনের দিক থেকে যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়, সেগুলি অনেক বেশি আশু ও দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার একার। ভারতকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সীমান্তে সামরিকভাবে নিযুক্ত থাকতে হয় ও দুই দেশের ক্ষমতার মধ্যে গভীর পার্থক্য থাকায়, ভারত বেইজিং-এর দিক থেকে আসা চাপ লাঘব করার জন্য কোয়াডের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এতে চিনের তীব্রতা সামান্য কমে বটে, কিন্তু ভারত তার পশ্চিমী মিত্রদেশগুলির কৌশলগত সহযোগিতাকে সীমিত রাখতেই চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমের দেশগুলি চিন *এবং* রাশিয়া, দুই দেশের ভূ-রাজনৈতিক সংস্কারবাদকেই আরআইও-র জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করে এবং ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণ যে আসলে এই বিন্যাসেরই উল্লঙ্ঘন বলে যে পাশ্চাত্যের দাবি, সে চায় তার প্রতি ভারতকে সংবেদনশীল হোক। তবে, নতুন দিল্লির প্রতিক্রিয়াটি স্নায়ু যুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ারের সময়ের ছায়ার দ্বারা চিহ্নিত এবং সমসাময়িক ভূ-রাজনীতির থেকে জাত যুক্তির সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি নেই।

বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান (আজকের যুগ যুদ্ধের যুগ নয় – মোদীর দ্বারা বারংবার উচ্চারিত এই মন্তব্যের কথা মনে করুন), সার্বভৌমত্ব ও প্রাদেশিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং নাগরিক জীবনের প্রতি সম্মান দেখান – ১৯৪৫-এর বিন্যাসের এই মূল স্তম্ভগুলির পক্ষে রাশিয়ার কার্যকলাপ যে হানিকর, তার উপর নতুন দিল্লি জোর দিয়েছে। কিন্তু, ভারত আরআইও-র ভাষায় যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেছে এবং যখন এই বিষয় নিয়ে এই দেশকে কথা বলতে জোর করা হয়, তখন তারা পশ্চিমের দেশগুলিকে সঙ্কীর্ণচিত্ত বলে অভিযোগ জানায় ও আরও বলে যে, পশ্চিমের শক্তিগুলি সাম্প্রতিক অতীতের নিয়ম-নির্ভর বিন্যাস নিয়ে এশিয়ার রঙ্গমঞ্চের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না।

তার উপর, ২০২৪-এর জুলাই মাসে মোদীর রাশিয়া ভ্রমণের ঘটনাটি, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পদক্ষেপের তীব্রতা কমিয়ে দেয়। পুতিনের সঙ্গে অধিবেশন চলাকালীন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মোদী তাঁর উপরিউক্ত অবস্থানটির পুনরাবৃত্তি করেন এবং অধিবেশনের আগের দিনই কিয়েভের একটি হাসপাতালে রাশিয়ার মিসাইল আক্রমণের ফলে শিশুমৃত্যুর নিয়ে পরোক্ষে তাঁর মনোবেদনা জানান। কিন্তু, উষ্ণ আলিঙ্গন, অমায়িক কথাবার্তা ও পুতিনের হাত থেকে মোদীর রাশিয়ার উচ্চতম অসামরিক সম্মান গ্রহণ যেন রাশিয়ার এই অপ্রীতিকর শাসনকাল, যা দেশের অভ্যন্তরে দমনমূলক ও যার বাহ্যিক কার্যকলাপ বিশ্বের বিন্যাসকে দুর্বল করে তোলে, তাকে বৈধতা দান করে।

হতে পারে যে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করে, নতুন দিল্লি মস্কো ও বেইজিং-এর মধ্যে দ্রুত বর্ধমান নৈকট্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু, রাশিয়ার জন্য চিন যা করছে ভারতের দিক থেকে তার মূল্যকে

অতিক্রম করতে সক্ষম হওয়ার উপরে এই কৌশলের কার্যকারিতা নির্ভর করছে। চিনের সম্পদের পরিমাণ সুবিশাল, এবং যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়, তবে পশ্চিমের শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তার আছে এবং এই কারণেই এই সম্পর্কের অঙ্কে চিন অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। একই সঙ্গে, একটি প্রধান আন্তঃমহাদেশীয় শক্তি হিসেবে, রাশিয়া কখনই চিনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাইবে না এবং ভারতের কৌশলগত পদক্ষেপ হল ঠিক এই বিষয়টিকে কাজে লাগান। কিন্তু, এই কৌশলটি অনুসরণ করতে হলে পশ্চিমের শক্তিগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠবে, এবং তা আদৌ তা ঠিক হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই প্রশ্নটি তখনই তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যখন লক্ষ্য করা যায় যে চিন-রাশিয়া সম্পর্কটি উত্তর কোরিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে উদীয়মান একটি অতিসক্রিয় স্বৈরতন্ত্র-কেন্দ্রিক বিন্যাসের অংশ। নতুন দিল্লির কি আদৌ উচিত এই রকম একটি বিন্যাসকে পোষকতা দেওয়া?

তৃতীয়ত, আরেকভাবে নতুন দিল্লির কার্যকলাপ, তার বিন্যাস নির্মাণের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয়। যদিও, পশ্চিমী কৌশল এখনও পর্যন্ত ভারতের প্রতি অনুকূলই রয়েছে, কিন্তু বিস্ময়জনকভাবে, নতুন দিল্লি পশ্চিমের প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তা ক্রমশ আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরে, তার "সুদৃঢ়" পররাষ্ট্র নীতির ফলশ্রুতি হল পশ্চিমের শক্তিগুলির প্রতি উদ্দেশ্য করে কঠোরতর ভাষার প্রয়োগ।

অধিকন্তু, ভারতের এই দৃঢ় অবস্থানের একটি নতুন দিকও সংযোজিত হয়েছে। এই দিকটি হল কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খালিস্থানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎপাটন করার প্রয়াস এবং অস্ট্রেলিয়াতে তাদের উপর বল প্রয়োগ, যা সম্ভবত ভারতের নিরাপত্তা আধিকারিকদের দ্বারা সংগঠিত। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল কোয়াডে ভারতের সহ-সদস্য এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির বিশ্বকেন্দ্রিক কৌশল ও নিরাপত্তা পরিকাঠামোর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হল কানাডা। খালিস্থানীদের প্রতি এই আচরণের সমস্ত বিবৃতিকেই ভারত অবশ্য অস্বীকার করেছে। যাই হোক, এই বিবরণীগুলি সত্য হলে, ভারতের এই কাজ শুধু যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণের রীতিকে লঙ্ঘন করে তা নয়, সাংগ্রি-লা বক্তৃতায় মোদী যে "আইনের নিয়ন্ত্রণ"-এর কথা বলেছিলেন, তাকেও আহত করে। পশ্চিমে ভারতের যে সমালোচকরা আছেন, তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে,

যে চিন ও রাশিয়া পশ্চিমী সরকার ও সমাজকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে বলে অভিযুক্ত, ভারত তাদের সঙ্গে একই আসনে অধিষ্ঠিত।

দেশের ভিতরে, পশ্চিমের প্রেক্ষিতে নতুন দিল্লির এই সুদৃঢ় অবস্থানটির একটা বেশ বড় সমর্থক গোষ্ঠী আছে বটে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ভঙ্গিটি পররাষ্ট্র নীতিকে দুর্বল করে দেয়। বি-ঔপনিবেশিকরণের দিনগুলি থেকেই ভারত পশ্চিমের সমাজের অভিজাত অংশের কাছে যে সুনাম গড়ে তুলেছে, তা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা প্রায় সুনিশ্চিত। এর ফলে পশ্চিমের সরকারগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধানে ভারতের সঙ্গে ব্যবহার করছে। এ কথা সত্য যে, "বাকিদের" উত্থানের ফলে পশ্চিমের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের বিপরীতে এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু, বিশ্বের নিরাপত্তার অনুক্রমে পশ্চিম এখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে ভাবলে ভুল হবে। পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ার ঘটনাটিকে ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনের বিপরীতে দাঁড় করালে দেখা যাবে যে, নিজের স্বার্থ নিশ্চিত করতে ভারতের যে সম্পদের প্রয়োজন, সেই সম্পদই ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন দিল্লি একটি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পৃথিবী চায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সমন্বয় ও আরও বেশি করে দায়িত্ব গ্রহণ।

অতুল মিশ্র দিল্লি-এনসিআর-এ অবস্থিত শিব নাদার ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স অ্যান্ড গভর্নেন্স স্টাডিজের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক।